বাংলাদেশের তৈরি পোশাকখাত:
এমএফএ-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলার কৌশলপত্র

রিপোর্ট ২১

মূল্য - ২৫.০০

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ

বাড়ি নং৪০/সি, সড়ক নং-১১ (নতুন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯
ডাক যোগাযোগ: জিপিও বক্স নং-২১২৯, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৮১২৪৭৭০; ফ্যাক্স: ৮১৩০৯৫১; ই-মেইল: cpd@bdonline.com
ওয়েবসাইট: www.cpd-bangladesh.org

জানুয়ারি ২০০৩

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল বিভিন্ন সংগঠনের সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপিডি প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্দেশ্য হল একটি জবাবদিহিতামূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের সুশীল সমাজের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা। এ লক্ষ্য পূরণে সিপিডি গবেষণা, বিশ্লেষণ ও সংলাপ আয়োজনসহ বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড সংগঠিত করে আসছে।

সিপিডি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষকে নিয়ে নিয়মিত সংলাপ পরিচালনা করে থাকে যার মাধ্যমে তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে কেন্দ্র করে মুক্ত আলোচনার স্বপক্ষে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সিপিডি সবসময় সচেষ্ট। এসব সংলাপের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সিপিডি বাংলাদেশের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উপর দেশের জনগণের অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে সিপিডি সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দল, শ্রমিক ও পেশাজীবী জনগণ, ব্যবসায়ী মহল, জনপ্রতিনিধি, নীতিনির্ধারকবৃন্দ, সরকারী আমলা, উন্নয়ন-অংশীদারসহ বিশেষজ্ঞগণ, তৃণমূল পর্যায়ের সংগঠনের নেতৃবর্গ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল গ্রুপসমূহকে নিয়ে নিয়মিত নীতি-সংলাপ আয়োজন করে থাকে। সিপিডি-র লক্ষ্য হল এ ধরনের সংলাপ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে সব নীতিমালার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, সেগুলোর পক্ষে ব্যাপক জনমত ও সমর্থন গড়ে তোলা। বিগত সময়ে এ সকল কর্মকান্ডের মাধ্যমে সিপিডি একটি নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে ও সুশীল সমাজের ব্যাপক আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

সংলাপ প্রক্রিয়ার তত্ত্ব ও তথ্যগত ভিত্তি সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সিপিডি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকে। এ গবেষণাগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনা (আই.আর.বি.ডি.) অন্যতম। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চলমান গবেষণা কর্মসমূহের মধ্যে আছে বানিজ্য নীতি বিশ্লেষণ ও বিশ্ববানিজ্য সংস্থা (ডব্লিউ,টি,ও) - এর প্রভাব পরিবীক্ষণ, দক্ষিন এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা, জনসংখ্যা ও টেকসই উন্নয়ন, বিনিয়োগ ও উদ্যোগের প্রসার, সুশাসন ও উন্নয়ন, স্বাস্থ্যখাতের ব্যবস্থাপনা, রুগ্ন শিল্পের পুনর্বাসন ও বেসরকারীকরণ প্রক্রিয়ার পর্যালোচনা। এসব গবেষণা সিপিডি-র সংলাপ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধতর করছে। সিপিডির অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে নীতি ইস্যু ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সময়ে সময়ে জনমত জরিপ পরিচালনা এবং নবীণ/তরুণদের নেতৃত্বদান।

সিপিডি-র গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য ও জ্ঞান সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে দেয়া। এ কার্যক্রমের সুষ্ঠু সম্পাদনার জন্য সিপিডি-র একটি সক্রিয় প্রকাশনা কর্মসূচীও (বাংলা ও ইংরেজি) রয়েছে। এ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে সিপিডি নিয়মিতভাবে 'সিপিডি সাময়িক পত্রাবলী' (CPD Occasional Paper Series) প্রকাশ করে থাকে। সংলাপের পটভূমি পত্র, অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন ও বৃহত্তর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জনমতামত জরিপ ফলাফল এ সিরিজের অংশ হিসাবে প্রকাশিত হয়।

'বাংলাদেশের তৈরি পোশাকখাত: এমএফএ উত্তর পরিস্থিতি মোকাবিলা' শীর্ষক এ প্রবন্ধটি মে ৪, ২০০২ তারিখে সিরডাপ অডিটোরিয়ামে অক্সফ্যাম বাংলাদেশ-এর সহযোগিতায় সিপিডি আয়োজিত ''এমএফএ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলা: বাংলাদেশের তৈরি পোশাকখাতের সম্ভাব্য কৌশলপত্র" শীর্ষক একটি সংলাপে উপস্থাপিত হয়। প্রবন্ধটি প্রস্তুত করেছেন সিপিডির চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহানের নেতৃত্বে একটি গবেষণা টীম এবং এর বাংলা অনুবাদ করেছেন জনাব আসজাদুল কিবরিয়া, সংবাদ প্রতিবেদক, প্রথম আলো।

সহকারী সম্পাদক : *আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ*, প্রধান, ডায়লগ ও কমিউনিকেশন বিভাগ
সিরিজ সম্পাদক : *ড: দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য*, নির্বাহী পরিচালক, সিপিডি।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাকখাত:
এমএফএ-পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলার কৌশলপত্র

১. রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকখাতের শ্রমিকদের জীবিকা সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী প্রচারণার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকখাতের গুরুত্ব

নিম্ন আয়ের যেসব দেশ বিশ্ব বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে লাভবান হয়েছে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। এক্ষেত্রে এদেশের শ্রমনির্ভর রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাকখাতের সাফল্যকে একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়। সত্তরের দশকের শেষভাগে গুটিকয়েক কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাংলাদেশে তৈরী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু। ১৯৭৮ সালে এসব কারখানা তাদের প্রথম চালান বিদেশে পাঠায়। আর আজকে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ৩৫০০ ও এর বেশী কারখানায় কর্মরত ১৬ লাখ শ্রমিক কর্মরত রয়েছে যাদের ৬৬ শতাংশের বেশি আবার নারী। ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইপিজেডের তৈরী পোশাক কারখানাগুলোয় কর্মরত মোট শ্রমিক্রে ৭০ শতাংশের বেশি নারী। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সমগ্র শিল্পখাতের মোট কর্মশক্তির মাত্র ১৫ শতাংশ নারী। পোশাক শিল্পের বেশিরভাগ নারী শ্রমিকই এসেছে পল্লী অঞ্চল থেকে। এ শিল্পের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর বিশ্ব বাজারে প্রবেশ এসব নারীদের কর্মসংস্থান ও উপার্জনের সুযোগ করে দিয়েছে। ফলশ্রুতিতে তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে।

বাংলাদেশের শিল্পখাতের মোট জনশক্তির এক-তৃতীয়াংশ তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত রয়েছে এবং শিল্পখাতের মোট মূল্য সংযোজনের এক-চতুর্থাংশও পোশাকখাতেরই অবদান। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৭৫ শতাংশের বেশি আসে এই খাত থেকে। ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বহুলাংশে পোশাকখাতের ওপর নির্ভরশীল এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে এ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অর্থনীতিতে পোশাকখাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণেই এ শিল্পে যে কোনো ধরনের বিপর্যয় গোটা অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য। বাংলাদেশে ব্যাংক, বীমা, বন্দর, হোটেল, পরিবহন, বস্ত্র, আনুষঙ্গিত পণ্য, প্যাকেজিং, প্রিন্টিং-এমন কোনো শিল্প নেই যা এই খাতের সচলতার ওপর নির্ভরশীল নয়। আবার এখাতে নারী শ্রমিকের প্রাধান্য বেশি। দেখা গেছে যে, মহিলাদের প্রান্তিক সঞ্চয় প্রবণতা হার ৬ শতাংশ এবং পুরুষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে এই হার ৪ শতাংশ।

পোশাকখাতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সৃষ্ট মজুরি বা উপার্জন এ খাতের শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি স্থানীয় অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও সচল রাখতে সহায়তা করছে। শ্রমিকদের আয় কেবল তাদের ভোগকে তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, প্রসাধন, বিনোদনের পেছনেই নয়, বরং স্বাস্থ্যসেবাসহ অন্যান্য মানব উন্নয়ন কাজেও ব্যয় হয়। যদিও এ খাতের শ্রমিকদের জীবনযাত্রা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শোচনীয়, তারপরও অধিকাংশ নারী শ্রমিকই বিদ্যুৎ, বিশুদ্ধ পানি ও গ্যাসের সুবিধা নিয়ে থাকার ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। পোশাকখাতে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পল্লীর দারিদ্র জীবন থেকে ১০ লাখের বেশি নারীকে নগর অর্থনীতিতে নিয়ে আসায় সমাজের ওপর নাটকীয় পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে। শহর ও গ্রাম উভয় অঞ্চলেই নারীদের কাজের ব্যাপারে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা বদলে গেছে। বদলে গেছে সমাজে নারীর সনাতন ভূমিকার বিষয়টিও। এই পুরো প্রক্রিয়া নারী শ্রমিকের ক্ষমতায়নে, এমনকি তাদের জন্মহারহ্রাসেও ভূমিকা রেখেছে।

মাল্টি ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্টের (এমএফএ) মেয়াদ অবসান: বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শ্রমিকদের জীবিকার ওপর এর প্রভাব

বস্ত্র ও পোশাক বিষয়ে উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তির (এটিসি) আওতায় সম্পাদিত মাল্টি-ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্ট (এমএফএ) বিশ্ব বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনাসমূহের দীর্ঘ ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। এর সম্ভাব্য ফলাফল বহুমুখী বাণিজ্যিক পর্বের জন্য একটি বড় ধরনের পরীক্ষাও বটে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ইতিমধ্যে এর সপ্তম বছরে পা রেখেছে। এই বছরগুলো প্রথম দিককার প্রত্যাশাগুলো হারিয়ে যাওয়ার কাল হিসেবে চিহ্নিত হবে। অপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলোর কারণে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ক্রমে এই আতংক ছড়িয়ে পড়ছে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন তাদের অবস্থানকে আরো প্রান্তিক পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে বা কোণঠাসা করে ফেলছে। উরুগুয়ে রাউন্ডের সময় ধনী ও দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে যে ঐকমত্য গড়ে উঠেছিল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সিয়াটল বৈঠকের ব্যর্থতায় তা কার্যত ভেঙে যায়। উরুগুয়ে রাউন্ড পরবর্তী সময়ের ঘটনাবলী এ ধারণাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্ভাবনা বর্তমান থাকলেও এতে যথেষ্ট পরিমাণে ঝুঁকিও রয়েছে।

এমএফএ-র মেয়াদ অবসান ও এটিসির সম্ভাব্য অভিঘাত তৈরি পোশাক রপ্তানির ওপর অত্যাধিক নির্ভরশীল বাংলাদেশের জন্য বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার দীর্ঘদিনের সুপ্ত সমস্যাসমূহকে সামনে নিয়ে এসেছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় এখাত সংশ্লিষ্ট আরো যেসব উন্নয়ন সংঘটিত হচ্ছে কার্যত সেগুলো কেবল অর্থনীতিতেই নয় বরং বিপুল সংখ্যক দরিদ্র নারীর সামাজিক অবস্থানের ওপরও সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। দুর্ভাগ্যজনক হলো, এমএফএ-র দীর্ঘস্থায়ীত্বের বদৌলতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বস্ত্রখাত সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত খাতগুলোর অন্যতম হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। পরিবর্তিত রাজনৈতিক অর্থনীতির কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্ব বস্ত্র বাণিজ্য ব্যবস্থাপনার কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে।

১৯৭৪ সালে এমএফএ কার্যকর হওয়ার পর থেকে এটি বস্ত্র ও তৈরি পোশাক খাতের বাণিজ্যেও নিয়মনীতি নির্ধারণ করছে। এসব নিয়মের আওতায় বড় আমদানিকারক দেশগুলো দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে পরিমাণগত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। নির্দিষ্ট কিছু দেশের ক্ষেত্রে পোশাক রপ্তানিতে কোটা আরোপ করে মূলত গ্যাটের নীতিমালা এড়িয়ে বস্ত্র ও তৈরি পোশাকখাতের বাণিজ্য সম্পন্ন হয়েছে। রপ্তানিকারক দেশগুলো এর ফলে কেবল বাজারের নিরাপত্তাই পায়নি, বরং সীমিত সরবরাহের সুযোগে আয়ের সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে। বিনিময়ে অবশ্য তাদেরকে স্বেচ্ছায় সীমিত রপ্তানির বিষয়টি মেনে নিতে হয়েছে।

তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক উন্নয়নশীল দেশগুলো বস্ত্রখাতে গ্যাট ব্যবস্থাপনা বাতিলের জন্য অনেকদিন থেকে বলে আসছিল। আর তাই উরুগুয়ে রাউন্ডের চূড়ান্ত ফল হিসেবে এটিসির অন্তর্ভুক্তিকে একটি ইতিবাচক দিক হিসেবেই দেখা হয়েছে।

২০০5 সালের ১ জানুয়ারি থেকে এমএফএ-র মেয়াদ অবসান হলে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য বিশ্ব বাজার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তবে এমএফএ পরবর্তী সময়ে বিশ্ব বাজারে অংশীদারিত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হবে। পোশাক ও বস্ত্রের সম্প্রসারিত বাজারে তাদের অংশ বাড়ানোর বিষয়টি রপ্তানিকারক দেশগুলোর প্রতিযোগিতা সক্ষমতার ওপর নির্ভর করবে। তৈরি পোশাক শিল্পের মতো শ্রমঘন খাতে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিই হবে প্রতিযোগিতা সক্ষমতার মূল, যা কি না আবার নির্ভর করবে প্রযুক্তির স্তর, প্রযুক্তি গ্রহণ ক্ষমতা, প্রযুক্তি স্থানান্তর, মজুরির সুবিধা, কাজের পরিবেশ, দক্ষতা উন্নয়নসহ অন্যান্য উপাদানের ওপর।

সার্বিকভাবে, উল্লিখিত উপাদানগুলোর ওপরই এসব দেশের রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিকের জীবিকার স্থিতিশীলতা বা স্থায়িত্ব নির্ভর করবে। রপ্তানি যদি কর্মসংস্থান ও আয় বাড়াতে সক্ষম হয় তাহলে জীবিকার স্থিতিশীলতাও বাড়বে। অন্যদিকে প্রতিযোগিতাশীলতা ধরে রাখতে না পারলে এই স্থিতিশীলতাও থাকবে না, যা কার্যত কর্মহীনতা ও আয় বৈষম্য বাড়াবে এবং

শ্রমিকের মূল্য নিম্ন পর্যায়ে রাখার জন্য মৌলিক শ্রমিক অধিকার লংঘিত হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ খাতে যে কোনো ধরনের বিপর্যয় কর্মহীন শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াবে যা বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যয় বাড়িয়ে দেবে। বস্তুত বর্তমান বাজারের অংশীদারিত্ব ধরে রেখে তা বাড়ানোর জন্য প্রতিযোগিতাশীলতার ক্ষমতা বৃদ্ধি ব্যাপকভাবে এ শিল্পের শ্রমিকদের জীবিকার ওপর প্রভাব ফেলবে, যা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

বিশ্বব্যাপী প্রচারণার উদ্যোগ: মূল উদ্দেশ্য

দারিদ্র্য বিমোচন ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণের বিশ্বজনীন যে উদ্দেশ্য রয়েছে তা প্রতিটি দেশের এককভাবে এবং বিশ্ব সম্প্রদায় হিসেবে সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের চেষ্টা করা উচিত। এ বিষয়গুলো জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার নীতিমালায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এসব লক্ষ্য অর্জন ও তা ধরে রাখার ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন ও বিশ্ব বাণিজ্যের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে এসব লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টি অনেকাংশেই নির্ভর করছে আগামী দিনগুলোতে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্প কীভাবে অগ্রসর হবে তার ওপর।

তৈরি পোশাক শিল্পে বাংলাদেশের সাফল্য মূলত এমএফএ-র আওতায় সৃষ্ট বাণিজ্যিক পরিবেশের কারণে সম্ভব হয়েছে। আর তাই বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা দুর্বল হওয়ার আশংকার প্রেক্ষিতে এমএফএ-র মেয়াদ অবসানের কারণে উদ্ভুত পরিবর্তিত বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করতে হবে। বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের জন্য যে কোনো বিপর্যয় এখাতের নারী শ্রমিকদের জীবন-জীবিকা ও তাদের পরিবারের ওপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আর তাই এই মুহূর্তে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতের ও এর শ্রমিকদের সমস্যাসমূহের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।

উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর পোশাক শিল্প খাত ও এর শ্রমিকদের বিষয়টি নজরে আনার জন্য অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনাল ২০০২ সালে একটি বিশ্বব্যাপী প্রচারণা কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সর্বোচ্চ সুফল পাওয়ার লক্ষ্যে জাতীয়, আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন পর্যায়ে এ প্রচারণা চালানো হবে। প্রতিটি স্তরেই স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নিয়ে কাজ করা হবে। বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ে কর্মরত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং উন্নত দেশের সরকারগুলো উল্লেখিত বিশ্বব্যাপী প্রচারণার লক্ষ্য যা কিনা বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর ন্যায্য চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সরকার ও শিল্পখাত সংশ্লিষ্টদেরকে জাতীয় প্রচারণার মূল লক্ষ্য ধরা হয়েছে, যেখানে এ খাতের স্থিতিশীলতার জন্য একটি ব্যাপকভিত্তিক স্থানীয় অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হবে। তৈরি পোশাক শিল্প যেহেতু বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেহেতু এই বিশ্বব্যাপী প্রচারণায় ৬টি দেশের একটি হিসেবে বাংলাদেশকে বেছে নেয়া হয়েছে।

অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে মিলে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি) একটি প্রচারণা কৌশলপত্র নির্ধারণের কাজ করছে। এই কৌশলপত্র এমএফএ পরবর্তী সময়ে তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের জীবিকা সংরক্ষণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের দিক নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

কৌশলপত্র প্রণয়ন পদ্ধতি

স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে এই কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো আলোচনার জন্য একটি ধারণাপত্র প্রস্তুত করা হয়। পোশাক শিল্প উদ্যোক্তা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, গবেষক এবং এনজিও কর্মীদের সঙ্গে আলাদাভাবে তিনটি সংলাপের আয়োজন করা হয়। এসব সংলাপে আলোচনার জন্য ধারণাপত্রটি বিতরণ করা হয়। প্রতিটি সংলাপের পরামর্শ ও আলোচনার ভিত্তিতে ধারণাপত্রটি একাধিকবার সংশোধন ও

পরিমার্জন করা হয়, যা কি না প্রচারণাপত্র প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। মূলত ধারণাপত্রে বিবৃত বিষয়সমূহ, সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও পরামর্শ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের আলোকে প্রচারণা কৌশলপত্র তৈরি হয়।

কৌশলপত্রের চারটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে বিশ্বব্যাপী প্রচারণার প্রেক্ষিত আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পোশাক শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রচারণার কর্মকাঠামো পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং চতুর্থ অধ্যায়ে তৈরি পোশাক শ্রমিকদের জীবিকা নির্বাহ সমর্থনে বিশ্বব্যাপী প্রচারণার কৌশল বর্ণিত হয়েছে।

২. পোশাক শিল্পের চ্যালেঞ্জ এবং শ্রমিকদের জীবিকার চালচিত্র

২.১ তৈরি পোশাক শিল্পের অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জসমূহ

পোশাকখাতের শ্রমিকদের বঞ্চনা

দু:খজনক হলেও সত্য যে, দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনার শিকার। কাজে যোগদানের পর থেকেই এই বঞ্চনার সূত্রপাত হয়। শ্রমিকদের কাজের পরিধি উল্লেখসহ কোনো আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র প্রদান করা হয় না। ১৯৯৪ সালে ন্যূনতম মজুরি অধ্যাদেশ প্রণীত হলেও একযোগে এটির বাস্তবায়ন স্থগিত রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিকখাতে কর্মরত শ্রমিকরা কারখানা আইন ১৯৬৫-র আওতায় মজুরির বাইরে বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা যেমন, আবাসন ও পরিবহন সুবিধা, ভর্তুকি মূল্যে খাদ্য, চিকিৎসা ভাতা, বোনাস, পেনশন, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও বীমা সুবিধা পেয়ে থাকে। কিন্তু তৈরী পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা এসব সুযোগ-সুবিধা থেকে ব্যাপকভাবে বঞ্চিত। বিশেষ করে নারী শ্রমিকরা তাদের বৈধ অধিকার থেকে নানাভাবে বঞ্চিত এবং কর্মক্ষেত্রে নানাভাবে শোষিত হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণা-সমীক্ষার ফলাফল নির্দেশ করে যে, কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার লংঘন তাদের পুরুষ সহকর্মীদের তুলনায় পাঁচগুণ বেশি। প্রায়শই নারী শ্রমিকরা ঠিকমতো তাদের বেতন পায় না বা পেলেও কম পায় এবং নিয়োগকারী-সহকর্মীদের দ্বারা শারীরিকভাবে লাঞ্চনার শিকার হয়ে থাকে। বাসস্থান, পরিবহন ও অন্যান্য ব্যয় মিটিয়ে বেশিরভাগ নারী শ্রমিকের পক্ষেই ঠিকমতো খাওয়ার খরচ নির্বাহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে বেশিরভাগ নারী শ্রমিকই অপুষ্টিতে ভোগে, যা তাদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়।

দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের প্রবৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো সস্তা শ্রমিকের বিশেষত নারী শ্রমিকের পর্যাপ্ত সরবরাহ। এসব শ্রমিক তুলনামূলকভাবে কম জটিল কাজের জন্য প্রশিক্ষণ পেয়েছে, যেখানে সেলাই-ই প্রধান। পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের ব্যর্থতা আসলে বাংলাদেশের এই শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। নিম্ন উৎপাদনশীলতার কারণে পোশাক শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতার শক্তি হ্রাস পেয়েছে এবং উচ্চ মূল্য সংযোজনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে পিছিয়ে রেখেছে। এখানে উল্লেখ্য যে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পোশাক শিল্পের শ্রমিক বিভাজনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছে: (ক) কারখানাগুলোয় উন্নত প্রযুক্তিভিত্তিক পরিচালন কার্যক্রমে অধিকহারে পুরুষ শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে; এবং (খ) পোশাক শিল্পখাত ওভেন থেকে নিটওয়্যারের দিকে ক্রমেই সরে আসায় এখানেও অধিকহারে পুরুষ শ্রমিক নিয়োগ করা হচ্ছে। এর কারণ হলো নিটওয়্যারের উৎপাদন কার্যক্রম সেলাই নির্ভর ওভেন পোশাকের উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে অনেকটা ভিন্ন যেখানে নারী শ্রমিকরা অধিকতর যোগ্য।

পোশাক খাতে প্রশিক্ষণ সুবিধার প্রায় পুরোটাই পুরুষ শ্রমিকদের দিকে গেছে, যা আসলে নারী শ্রমিকদের ওপর নিয়োগকারীদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ফলানোর নেতিবাচক মানসিকতারই প্রকাশ। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, গত ৫ বছরে দেশে ইউএনডিপির অর্থায়নে পরিচালিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসহ সমস্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাত্র ২০ শতাংশ ক্ষেত্রে নারীরা সুযোগ পেয়েছে। এটি তৈরি পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রেও সত্যি। অধিকন্তু নারীদের ব্যবস্থাপক পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে কারখানায় কাজের পরিবেশ রীতিমতো প্রতিকূলে।

বহু শিল্প উদ্যোক্তা দীর্ঘমেয়াদে নারী শ্রমিকদের কাজে থাকার ব্যাপারে সন্দিহান হওয়ায় তাদের দক্ষতা উন্নয়নে আগ্রহী নন। আবার ১০ বছর মেয়াদি এমএফএ-র অবসান হতে চলেছে। এ অবস্থায় পোশাক খাতের ভবিষ্যৎ নিয়ে শংকিত হয়ে উদ্যোক্তারা শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আরো বেশি অনাগ্রহী হয়ে পড়েছেন।

অপুষ্টি

পোশাক শিল্প শ্রমিকদের জন্য অপুষ্টি একটি নিষ্ঠুর বাস্তবতা। যদিও বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে উৎপাদনশীলতা ও অপুষ্টির মধ্যে সরাসরি কোনো সম্পর্ক স্থাপন করা যায়নি, তবুও এটা স্পষ্ট যে, অপুষ্টি স্বাস্থ্যের ওপর দীর্ঘমেয়াদে প্রভাব ফেলে, যা আবার প্রভাব ফেলে উৎপাদনশীলতার ওপরও। ১৯৯৮ সালে ১৭টি গার্মেন্টস কারখানার ওপর পরিচালিত এক জরিপ থেকে দেখা যায়, পোশাক শিল্প শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের অবস্থা বিপজ্জনক। সম্প্রতি পরিচালিত অন্য এক জরিপ থেকে জানা যায় যে, পুষ্টির উন্নতিতে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। একটি গবেষণা প্রকল্পে শ্রমিকদের কম খরচে সম্পূরক খাদ্য হিসেবে আয়রন ট্যাবলেটের যোগান দেওয়ায় তা তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছে।

ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণ : এখনও চ্যালেঞ্জ

পোশাক খাতের শ্রমিক নেতাদের মতে, ন্যূনতম জাতীয় মজুরির ইস্যুটি মালিক-শ্রমিককে দু'শিবিরে বিভক্ত করে রেখেছে। সরকার ন্যূনতম মজুরি আইন পাস করানোর উদ্যোগ নিয়েছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক উদ্যোক্তা আদালতের আশ্রয় নেয়ায় এর কার্যকারিতার ওপর সাময়িক আইনি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মূল সম্মেলনের ১৩৮তম অনুচ্ছেদ এখনও বলবৎ করেনি। এই ধারায় শ্রমিকদের বিশ্বজনীন মৌলিক অধিকারগুলোর স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

শ্রমিক নেতৃবৃন্দ যে বিষয়গুলোকে পোশাকখাতের শ্রমিকদের স্বার্থে বিশ্বব্যাপী প্রচারণায় তুলে আনার ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন সেগুলো হলো:

- বিশ্বব্যাপী গ্রহণযোগ্য ন্যূনতম মজুরি।
- কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা।
- নতুন নিয়োগকৃত শ্রমিকদের নিয়োগপত্র।
- আবাসন সুবিধা।
- সাপ্তাহিক ছুটি।
- পরিবহন সুবিধা (বিশেষত রাতে যেসব নারী শ্রমিকদের বাড়ি ফিরতে হয়)।
- ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার।
- সকল সুবিধাসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি।
- কাজের সময় শিশু পরিচর্যার সুযোগ।

- মালিক কর্তৃক শারীরিক নির্যাতনের রক্ষাকবচ।

কাজের পরিবেশ ও নিরাপত্তা

অধিকাংশ পোশাক শিল্প কারখানাই পর্যাপ্ত ভৌত সুবিধাদি নিয়ে গড়ে ওঠেনি। ১৯৯৯ সালে দেশের ৯০ শতাংশ পোশাক শিল্প কারখানা পরিচালিত হতো বিভিন্ন ভাড়া বাড়িতে, যেগুলো আসলে কারখানার জন্য নির্মিত নয়। কর্মক্ষেত্রে কাজের পরিবেশের নিরাপত্তার প্রশ্নটি তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পোশাক শিল্প কারখানার কাজের ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা আসলে এই শিল্পের অপরিকল্পিত ও এলোমেলো বিকাশেরই ফল। সাধারণত মালিকরা *কারখানা আইন* ১৯৭৯-কে গুরুত্ব দেয় না বললেই চলে। অথচ এ আইনে কাজের পেশাগত নিরাপত্তার কথা বলা হয়েছে। যেসব ছোট ছোট কারখানা বড় গার্মেন্টসের কাছ থেকে সাব-কনট্রাক্ট নিয়ে কাজ করে সেগুলোর অবস্থা আরো শোচনীয়।

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) বিধিমালা লংঘন করে পোশাক শিল্প শ্রমিকদের দিয়ে প্রায়ই দীর্ঘ সময় ধরে একটানা কাজ করানো হয়। ফলে তারা বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে যা তাদের উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। একাধিক সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে, রপ্তানিমুখী শিল্পের শ্রমিকদের রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার হার অন্যান্য শিল্পের শ্রমিকদের তুলনায় তিনগুণ বেশি। পোশাক শিল্পও এর ব্যতিক্রম নয়। বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্য বিষয়ে মনোযোগী না হওয়ায় পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে।

বিশ্ব বাজারে তৈরি পোশাক খাতের সম্প্রসারণের ফলে অবশ্য শ্রম ও নিরাপত্তা মানের বিষয়টি গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে। সামনের দিনগুলোতে তাই কাজের পরিবেশ নিয়ে আরো বেশি যত্নবান হতে হবে। যেহেতু এখাতের বেশিরভাগ বিষয়ই বাজার সুবিধা ও পোশাক রপ্তানির প্রতিযোগিতাশীলতা সক্ষমতার সঙ্গে সম্পৃক্ত সেহেতু মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি এই শিল্পের টিকে থাকার জন্য খুবই জরুরি। শ্রম-ইস্যু সম্পর্কিত প্রধান চ্যালেঞ্জগুলো হলো: (ক) কারখানায় সুস্থ কাজের পরিবেশ গঠনে শ্রমিক সংঘের ভূমিকা নিয়ে মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে যথাযথ বোঝাপড়ার অভাব ; এবং (খ) আইনের অপ্রতুলতা এবং প্রচলিত আইনের প্রয়োগে কার্যকর পদ্ধতির অভাবে শ্রম অধিকার সংরক্ষণ ও কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা।

শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা দু'টি মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনতে পারে। প্রথমত, মালিক-শ্রমিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ বৃদ্ধি পেয়ে পুরো শিল্পের কাজের পরিবেশ, দক্ষতা ও লাভের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। দ্বিতীয়ত, শ্রমমান ও কাজের পরিবেশের বিষয়ে ক্রেতারা স্পর্শকাতর হয়ে ওঠায় কাজের সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে না পারলে বাংলাদেশী পণ্যের প্রতি তারা বিমুখ হতে পারে। নিম্নমানের কাজের পরিবেশের কারণে ক্রেতারা বিমুখ হলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প তার বাজার হারাবে যা এ খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের আরো বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেবে।

২.২ <u>এমএফএ অবসানের প্রেক্ষিতে পোশাক শিল্পের বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ</u>

বাজার সংকোচন

বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বাজার সুবিধার ইস্যুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, উন্নত দেশগুলোয় বস্ত্র ও পোশাকের শুল্কহার এখনও যথেষ্ট বেশি (২০% থেকে ৩০%) । আর তাই উন্নত দেশগুলোতে স্বল্পোন্নত দেশের রপ্তানিকে শুল্কমুক্ত সুবিধা প্রদানের বিষয়টি এখনই কার্যকর করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে উন্নত দেশগুলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন উচ্চ

পর্যায়ের ঘোষণায় তাদের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য শুল্কমুক্ত সুবিধা বাংলাদেশের মতো দেশগুলোকে এমএফএ অবসান পরবর্তী সময়ে কিছুটা স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলার সুযোগ এনে দেবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় চীনের অন্তর্ভুক্তি, মেক্সিকো, এমনকি তুরস্কের মতো নতুন প্রতিযোগী (নাফটা বা ইইউতে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা পাচ্ছে) সে সময় আসলেই কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। ইউএসটিডিএ ২০০০ এর আওতায় এলডিসিভুক্ত ৪৯টি দেশের মধ্যে ৩৩টি দেশ তাদের পণ্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে কোটামুক্ত ও শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা পেয়েছে। এদেশগুলো সাব-সাহারান আফ্রিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ। এতে বাংলাদেশসহ অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশ আরো বেকায়দায় পড়েছে।

মান নিয়ন্ত্রণ ও অশুল্ক প্রতিবন্ধকতা

শ্রমমান, পরিবেশগত বিধিমালা, মানসম্মত ও নিরাপদ কর্মসংস্থান ইত্যাদি শর্তের ছদ্মাবরণে উন্নত দেশগুলো এখন বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের ওপর নিত্য নতুন ও কঠিন সব প্রতিবন্ধকতা চাপিয়ে দিচ্ছে। এছাড়াও রয়েছে প্রতিযোগিতার নীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় এমন সব শর্তাদি। আমদানিকারক দেশগুলোর পরিবেশবাদী সংস্থা, বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃপক্ষ ও বাণিজ্য অধিদপ্তর রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের ওপর এসব প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু-শ্রমের বিষয়টি তৈরি পোশাক পণ্যের বাজার সুবিধার ক্ষেত্রে ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। অনেক ক্ষেত্রে এ বিষয়গুলো সত্যিই উদ্বেগজনক হলেও স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে এখন এ আতংক ছড়িয়ে পড়ছে যে, উন্নত দেশগুলোর বস্ত্রখাত সংশ্লিষ্ট রক্ষণশীল মহল এগুলোকে পুজিঁ করে ফায়দা লুটতে পারে। পরিণতিতে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নষ্ট এবং তৈরী পোশাক পণ্যের বাজার সুবিধা হারাতে হতে পারে।

কারিগরি সহযোগিতা

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন চুক্তির আওতায় স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য প্রতিশ্রুত বেশিরভাগ কারিগরি সহযোগিতার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধারায় *সহযোগিতা* ও *সর্বোত্তম প্রচেষ্টা* এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে *নমনীয় প্রয়াস* উল্লেখ করা হয়েছে, যা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কিছু নয়। কারিগরি সহযোগিতা পাওয়ার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সচিবালয়ে দু'জন পরামর্শক নিয়োগ ছাড়া কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

সিঙ্গাপুরে প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য একটি *সমন্বিত ডব্লিউটিও কর্মপরিকল্পনা* গ্রহণ করা হয়েছিল। এতে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সহায়তার জন্য ডব্লিউটিও ও অন্যান্য বহুপাক্ষিক সংস্থার অধিকতর পারস্পরিক সহযোগিতার কথা বলা হয়। এই কর্মপরিকল্পনায় "চাহিদা-চালিত" সমন্বিত কর্মকাঠামোর (আইএফ) মাধ্যমে স্বল্পোন্নত দেশগুলোয় বাণিজ্য সম্পর্কিত কারিগরি সহযোগিতা সম্প্রসারণের কথা বলা হয়েছে। ৬টি প্রধান আন্ত:সরকারি প্রতিষ্ঠানসহ একাধিক বহুজাতিক, আঞ্চলিক ও দ্বিপাক্ষিক সংস্থা এই উদ্যোগের প্রণেতা। সমন্বিত কর্মকাঠামোর আওতায় স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সহায়তা দেয়ার বিধান রয়েছে যেন তারা তাদের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ও বাণিজ্যিক সুযোগ সম্প্রসারণ করতে পারে।

পোশাক শিল্পের সরবরাহজনিত প্রতিবন্ধকতার দিক থেকে কারিগরি সহযোগিতার বিষয়টি বিবেচনায় নিলে যে বিষয়গুলো উঠে আসে সেগুলো হলো: (ক) পশ্চাৎমুখী সংযোগ শিল্প স্থাপনের সক্ষমতা সৃষ্টি, এবং (খ) বাণিজ্য উন্নয়ন ও সহযোগিতায় প্রতিবন্ধকতা অপসারণের কার্যক্ষমতা সৃষ্টি বা অন্যকথায় সম্মুখমুখী সংযোগ সুবিধা গঠন। এর বাইরে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জন্য আরো যা প্রয়োজন তা হলো এ খাতের সমস্যা বুঝতে ও সমঝোতা কার্যক্রমে পারদর্শী একটি দক্ষ বাণিজ্য প্রশাসন

ব্যবস্থা গড়ে তোলা। বিশেষত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিরোধ নিষ্পত্তি কর্তৃপক্ষের (ডিএসবি) সঙ্গে বিভিন্ন বিরোধ নিষ্পত্তি ইস্যুতে কাজ করার জন্য এটি খুবই জরুরি।

স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য বিশেষ ও পৃথক ব্যবস্থা

স্বপ্লোন্নত দেশসমূহকে বিশ্ব বাণিজ্য প্রক্রিয়ার সঙ্গে অধিকহারে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো এসব দেশের জন্য বিশেষ ও পৃথক ব্যবস্থা (এসএন্ডডি)। স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে যেসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই এসএন্ডডি বাস্তবায়ন করা হয় সেগুলো হলো : (ক) শুল্ক মওকুফ;(খ) বিধিমালার প্রয়োগ বিলম্বিতকরণ;(গ) অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ;(ঘ) নমনীয় সময়সূচি;(ঙ) সর্বোচ্চ চেষ্টা;(চ) কারিগরি সহায়তা; এবং (ছ) রক্ষাকবচ ব্যবস্থা।

তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসএন্ডডি সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতিগুলো সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়নি। উন্নত দেশগুলোর নিজস্ব বিধি-বিধান, রাজস্ব ও নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির সময়ে সময়ে পরিবর্তনের ফলে এমএন্ডডি-র বহু কিছু এখনও বাস্তবায়িত হতে পারেনি। বেশিরভাগ উন্নত দেশ এগুলো বাস্তবায়ন করেনি।

সিভিডি/এডিডির মতো অশুল্ক প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ

সাধারণ বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া থেকে এন্টিডাম্পিংকে বাদ দেওয়ার বর্তমান ব্যবস্থা বিশ্ব বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য একটি বড় সমস্যা। সাম্প্রতিক সময়ে উন্নয়নশীল দেশগুলো বিভিন্নভাবে এন্টিডাম্পিং ও কাউন্টারভেলিং ব্যবস্থার শিকার হয়েছে। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী টেরিটাওয়েলখাত অতীতে এন্টিডাম্পিং-এর সম্মুখীন হয়েছিল। এন্টিডাম্পিং ইস্যুর একটি সম্ভাব্য সমাধান হতে পারে একে সাধারণ বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার মধ্যে নিয়ে আসা। এন্টিডাম্পিং প্রক্রিয়াটিও সহজ হওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে এটি একাধারে জটিল, ব্যয়বহুল ও খুব বেশি মাত্রায় টেকনিক্যাল। তবে নিকট ভবিষ্যতে বিরোধ নিষ্পত্তির পুরো প্রক্রিয়া দরিদ্র দেশগুলোর পক্ষে কাজ করবে এমন সম্ভাবনা নেই বলেই এসব পদক্ষেপ স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ার বিদ্যমান কাঠামো এবং এটি নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে দরিদ্র দেশগুলোর আইনগত ও কৌশলগত দক্ষতার অভাবই এর কারণ।

নৈতিক ক্রয়

নৈতিক ক্রয়ের (এথিকাল বাইং) ইস্যুটি বিশ্বজনীন প্রচারণায় যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বিশ্ব মন্দা ও যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার জের হিসেব তৈরি পোশাক শিল্পে সৃষ্ট বিপর্যয়ের সুযোগে কোনো যৌক্তিক কারণ ছাড়াই একতরফাভাবে কাটিং ও মেকিং চার্জ ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেওয়া অনৈতিক ক্রয়ের একটি বড় দৃষ্টান্ত। অনেক কারখানা এমনহারে কাটিং ও মেকিং চার্জের দর পেয়েছে যা দিয়ে উৎপাদন খরচ তুলে আনা খুব কঠিন। কাটিং ও মেকিং চার্জের বিপর্যয় অবশ্যই শ্রমিকের মজুরির ওপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য। পশ্চিমা বিশ্বের খুচরা বিক্রেতারা একইসঙ্গে উন্নত মান ও কম দামের পণ্য দাবি করে। এটা মেটাতে গেলে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সরবরাহকারীদের একমাত্র পথ হলো উৎপাদন ব্যয় কমানো, যা হলো আসলে শ্রমিকের মজুরি হ্রাস ও কাজের পরিবেশ নিম্ন করা। অন্যদিকে যেসব উদ্যোক্তা উন্নত শ্রমমান ও উন্নত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তারা আরো বিপাকে পড়েছে। বিশ্বজনীন প্রচারণায় পশ্চিমা বিশ্বের ক্রেতাদের সামনে এ বিষয়টি তুলে ধরা উচিত। বড় চেইন শপগুলোকে বিশেষ লক্ষ্য হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে রপ্তানিকারক দেশগুলোর আইনগত কর্তৃপক্ষ তথা সরকার প্রচারণা কাজে সহযোগিতা করতে পারে।

উল্লিখিত চ্যালেঞ্জগুলো একাধিক ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের ওপর নির্ভর করে। আর তাই পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জীবিকা সংরক্ষণে বিশ্বব্যাপী প্রচারণা বহুমুখী হওয়া উচিত যা সমস্যাসমূহ সমাধানে সহায়ক হবে।

৩. বিশ্বব্যাপী প্রচারণার পরিকল্পনা: মূল বিষয়সমূহ

প্রচারণায় যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা প্রয়োজন:

পোশাক শিল্পের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক - যে দু'ধরনের চ্যালেঞ্জের কথা বলা হয়েছে তা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে:

১. *আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি*, যা কয়েকটি অনুমিতির ওপর নির্ভরশীল: (ক) বাজারে প্রবেশের সমস্যা হতে শুরু করে বাণিজ্য ও অ-বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতার আকারে চাহিদার দিক থেকে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকবে না; (খ) অবকাঠামো বা বিনিয়োগ ঘাটতিজনিত কোনো ধরনের সরবরাহ প্রতিবন্ধকতা থাকবে না; (গ) পর্যাপ্ত পরিমাণ মানব সম্পদ ও প্রযুক্তি থাকবে। এই দৃশ্যপটে পোশাক শিল্প উৎপাদনশীলতা ও শ্রমিকের মজুরি বাড়াতে সক্ষম হবে, চমৎকার কাজের পরিবেশ থাকবে এবং রপ্তানির বৃদ্ধি ঘটিয়ে বর্তমান প্রবৃদ্ধির হার ধরে রেখে তার চলতে সক্ষম হবে। এটিসির বিগত ৬ বছরের কর্মকান্ডে অবশ্য একথা বলে যে, এরকম হওয়ার সুযোগ কম।

২. *হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি*, যা সচরাচর বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডর মতোই যেখানে যোগানের দিকটি স্থির থাকছে মানে মানব সম্পদের বিদ্যমান অপর্যাপ্ততা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত সংকট অব্যাহত থাকবে। চাহিদার দিক থেকে উচ্চহারে শুল্ক, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিভিন্ন অশুল্ক প্রতিবন্ধকতার কারণে বাজারে প্রবেশের সমস্যা অব্যাহত থাকবে। তার ওপর একদিকে চীন ও ভারত, অন্যদিকে বিশেষভাবে সুবিধাপ্রাপ্ত সাব-সাহারান ও ক্যারিবীয় দেশগুলো ও জর্ডানের মতো অন্যান্য দেশ বাংলাদেশের বাজারে ধস নামাতে পারে। এই দৃশ্যপটে শ্রমিক ছাঁটাই, রপ্তানি সংকোচন ও আয় হ্রাস পাবে। বিশ্ব বাজারে এ ধরনের পরিস্থিতিতে পোশাক রপ্তানিকারক যে কোনো স্বল্পোন্নত দেশের পক্ষে টিকে থাকা কঠিন হবে।

৩. *বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি* যা নির্ভর করছে সম্মুখমুখী ও কৌশলগত সরবরাহের ওপর। এটি সম্ভব হবে যথাযথ নীতিমালা গ্রহণের মাধ্যমে বিদ্যমান সংকটগুলো কাটিয়ে উঠে এবং কাজের পরিবেশ উন্নত করে ও উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে। বিশ্ব প্রেক্ষিতে এর মানে হলো বাজার সুবিধা ও চাহিদার প্রতিবন্ধকতাগুলো মেটাতে ডব্লিউটিওতে পদ্ধতিগত পরিবর্তন আনয়ন এবং পোশাকখাতের শ্রমিকদের স্বার্থে বিশ্বব্যাপী প্রচারণা জোরদারকরণ। আর দেশের অভ্যন্তরে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে এই শিল্পের ঝুঁকি সর্বনিম্নকরণ ও সুযোগ সর্বোচ্চকরণের মাধ্যমে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন।

যদি প্রথম দৃশ্যপটটি এমএফএ পরবর্তী সময়ের জন্য একটি পরিতৃপ্তির আভাস দেয় তাহলে দ্বিতীয় দৃশ্যপটটি হবে ব্যাপক উদ্বেগের। অন্যদিকে তৃতীয় দৃশ্যপটটি বিশ্ব পোশাক শিল্পের বাজারে আসন্ন পরিস্থিতির আলোকে জাতীয় সরকারসমূহের ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের সক্রিয় ভূমিকার তাগিদ দেয়।

প্রচারণার উদ্দেশ্যসমূহ

বিশ্ব বাজারে পোশাক শিল্পের অংশীদারিত্ব ধরে রেখে এবং তা বাড়ানোর মাধ্যমে এই শিল্পের শ্রমিকদের জীবিকা সংরক্ষণ ও উন্নয়নই হলো এই প্রচারণার মুখ্য উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে যে সব বিষয়ে আলোকপাত করতে হবে সেগুলো হলো:

(ক) উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা উন্নয়ন ও বাজার সুবিধা বাড়ানোর মাধ্যমে বাংলাদেশের তুলনামূলক সুবিধাকে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধায় রূপান্তর করা।
(খ) উন্নত দেশগুলোকে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সমস্যার বিষয়ে অধিক মনোযোগী করে অবাধ ও নিরাপদ বাজার সুবিধা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ নেয়া।

মূল কথা হলো, পোশাক শিল্পের স্বার্থে চাহিদা ও যোগান উভয় দিক থেকেই অধিক গতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোযোগ প্রয়োজন।

প্রচারণার একটি সার্বিক প্রয়াস

উপরের বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, বাংলাদেশে পোশাক শিল্প অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিকভাবে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এক্ষেত্রে তিনটি পর্যায়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন:

- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়মকানুন পুনর্নির্ধারণ ও সংশোধন;
- অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং
- বিভিন্ন বিধিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ।

বাংলাদেশের প্রচারণার স্বপক্ষ শক্তিসমূহের চিহ্নিতকরণ

রূঢ় বাস্তবতা হলো উন্নত বিশ্বে বাংলাদেশের কোনো কৌশলগত গুরুত্ব নেই। এটি বিবেচনায় রেখেই বর্তমানে উন্নত দেশসমূহ যে ইস্যুগুলোকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিচ্ছে প্রচারণায় সেই ইস্যুগুলোকে সম্পৃক্ত করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের ইস্যুটিকে বাজার সুবিধা বাড়ানোর প্রচারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা গেলে এটি প্রচারণার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হবে। যুক্তরাষ্ট্র-জর্দান দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি এবং পাকিস্তান ও ভারতের ওপর থেকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও কৌশলগত বিবেচনা গুরুত্ব পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে যেসব ধনী দেশ বাংলাদেশকে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য সাহায্য দেয় তাদের কাছে এ বিষয়টি তুলে ধরা যেতে পারে যে, তাদের বাজারে যদি বাংলাদেশী পণ্যের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় তাহলে এদেশের দরিদ্রতম অংশ লাভবান হবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে, ১৪ লাখ দরিদ্র্য লোকের ভাগ্য, যাদের ৭০ শতাংশ নারী, এখন নির্ভর করছে পোশাক শিল্প এর বর্তমান সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে কিনা তার ওপর।

মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও পোশাক শিল্পের টিকে থাকার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত দেশগুলোর বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতাশীলতা হারানোর ফলে এসব শ্রমিক যদি কাজ হারিয়ে ফেলে তাহলে তাদের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

যেসব গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন

যেসব ক্ষেত্রে জোর দিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচারণাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে সেগুলো বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় ৫টি প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

- পশ্চাৎ ও সম্মুখ সংযোগ সক্ষমতা, কারিগরি সামর্থ্য, অবকাঠামোগত সুবিধা ইত্যাদি সরবরাহজনিত প্রতিবন্ধকতা।
- বাণিজ্য-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ ও বাণিজ্য-সহায়ক সেবাসমূহের নিষ্ক্রিয়তা।
- উচ্চহারের শুল্ক, অশুল্ক প্রতিবন্ধকতাসমূহ, মান নিয়ন্ত্রণ ও রুলস অব অরিজিনের নামে বাজার প্রবেশের প্রতিবন্ধকতা।

- ডব্লিউটিও-র বিধি ও প্রক্রিয়া অনুসরণের পশ্চাৎপদতা।
- দেশের পোশাক শিল্পের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক অধিকারভোগীদেরকে বোঝানোর জন্য একটি উপযুক্ত ও পূর্ণাঙ্গ কৌশলের অভাব।

প্রচারণার লক্ষ্য

দারিদ্র বিমোচনে বাণিজ্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম হতে পারে। তবে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থান আসলে দরিদ্রদের বিপক্ষে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দুটো জিনিস জানা যায়। প্রথমত, দরিদ্র দেশগুলো বিশেষত এলডিসিসমূহ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার ফলে আরো বেশি প্রান্তিক পর্যায়ে চলে গেছে ('৯০-র দশকে বিশ্ব বাণিজ্যে এলডিসিসমূহের অংশীদারিত্ব পূর্বেও ০.৭ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ০.৪ শতাংশে)। দ্বিতীয়ত, বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত সুযোগসমূহের খুব কমই গরিবরা পেয়েছে, যদিও তাদেরকেই সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি নিতে হয়েছে। ফলে দরিদ্র দেশের দরিদ্র জনগণ দ্বিগুণ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে।

বাণিজ্যকে যদি টেকসই উন্নয়ন, ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্য অর্জন এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃত মানবাধিকার নিশ্চিতকরণের কাজে লাগানো যায় তাহলে তা অবশ্যই গরিবদের জন্য কাজে আসবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনাল অন্যায্য বাণিজ্য নীতি ও চর্চার বিরুদ্ধে ২০০২ সালের এপ্রিল থেকে বিশ্বব্যাপী "নিশ্চিত করো ন্যায্য বাণিজ্য" শীর্ষক প্রচারণার কাজ শুরু করেছে। জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে এই প্রচারণা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অক্সফ্যাম কাজ করে যাচ্ছে। অক্সফামের এই প্রচারণার মধ্যে ডাম্পিং, দ্রব্য মূল্য, বাজার সুবিধা, ট্রিপস, ওষুধ ও বীজসহ বিভিন্ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতকে অক্সফ্যাম একটি ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করে এখাতের প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও অবস্থা পরিবর্তনের দাবিতে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এমএফএ অবসানের ফলে বাংলাদেশের পোশাকখাত ব্যাপক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে এবং নিম্ন মানের কাজের পরিবেশ ও অন্যায্য শ্রমমানসহ বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ কারণে অন্যান্য অন্যায্য বিশ্ব বাণিজ্য নীতিমালা পোশাক শিল্পে প্রভাব ফেলবে। বর্তমানে পোশাক খাত বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের তিন-চতুর্থাংশের যোগান দিচ্ছে এবং এ খাতে ১৪ লাখের বেশি শ্রমিক কর্মরত রয়েছে, যাদের ৭০ শতাংশ নারী। এমএফএ অবসানে এখাতের শ্রমিকরা ভয়াবহ সংকটে পড়বে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রচারণার মাধ্যমে অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনাল আশা করছে, এক্ষেত্রে নীতিমালা ও কার্যক্রমে পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে যা কি না পশ্চিমা বিশ্বে ব্যাপক বাজার সুবিধা অর্জনে এবং ১৪ লাখ শ্রমিকের কাজের পরিবেশ ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সহায়তা করবে। এই লক্ষ্যসমূহ অর্জনে কাজ করতে অক্সফ্যাম ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অন্যান্যদের সঙ্গে জোট গড়ে তুলবে।

৩.১ প্রচারণায় সাফল্যের জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

ঐকমত গঠন

বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্প নিয়ে শ্রমিক ও মালিকদের মধ্যে এবং পশ্চাৎমুখী সংযোগ শিল্প নিয়ে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থগত বিরোধ রয়েছে। আর তাই পোশাক শিল্পের টিকে থাকার জন্য এসব বিরোধ মিটিয়ে এদের পরস্পরের মধ্যে মতৈক্য প্রতিষ্ঠা জরুরি। পোশাক শিল্পের স্বার্থসংশ্লিষ্ট সকলকে এটা বুঝতে হবে যে, তারা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে এই খাতের বিষয়ে কাজ

করেন তাহলে তাদের স্বার্থ রক্ষা হবে। এখন এটাই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণভাবে একটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থানই পারে বিশ্ব দরবারে দেশের দাবি জোরালো কণ্ঠে তুলে ধরতে।

জোট গঠন

অভ্যন্তরীণভাবে মতৈক্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পোশাক রপ্তানিকারক অন্যান্য স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সঙ্গে একজোট হওয়ার বিষয়টিও প্রচারণায় আসা প্রয়োজন। এতে বিশ্ব বাজারে তাদের দরকষাকষির অবস্থানটাও জোরালো হবে। বস্ত্র ও পোশাকের বৃহত্তর বাজার সুবিধা আদায়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতাতেই সমঝোতার মাধ্যমে একটি অভিন্ন প্রয়াস নেওয়া যেতে পারে। জোট গঠনের প্রক্রিয়ায় প্রচারণা কাজে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকদের জীবিকা সংরক্ষণে একটি অভিন্ন অবস্থান নেওয়ার স্বার্থে ব্যাপকভিত্তিক বিশ্বজনীন জোট গঠন করার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচারণায় সহযোগী খুঁজে বের করতে হবে।

বাংলাদেশের ইতিবাচক অর্জনগুলো তুলে ধরা

বাংলাদেশ যদি অন্যান ক্ষেত্রে তার সাফল্যগুলোকে তুলে ধরতে পারে তাহলে প্রচারণায় সাফল্য আসবে। বাংলাদেশ পোশাক খাতে শিশুশ্রমের ইস্যুটি যেভাবে সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করেছে, সেটি একটি বড় অর্জন। পোশাকখাতের শ্রমিকদের সামাজিক বিষয়গুলোর প্রতি বাংলাদেশ যে যথেষ্ট সচেতন তা তুলে ধরার ক্ষেত্রে এটি বিশেষ সহায়ক হবে।

৪. বিশ্বব্যাপী প্রচারণার কৌশলসমূহ

বিশ্বব্যাপী প্রচারণার সার্বিক প্রয়াস

পোশাক শিল্পের স্বার্থে বিশ্বব্যাপী প্রচারণার পরিকল্পনা প্রণয়নে অবশ্যই বিশ্ব সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ এবং অভ্যন্তরীণভাবে যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম এমন উপাদান ও কারণগুলোকে সামনে আনতে হবে। উন্নত বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক বা কৌশলগত কোনো ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এমন কোনো অবস্থান নেই যার মাধ্যমে বাজার সুবিধা আদায় সহজ হবে। অন্যদিকে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশের দাতাগোষ্ঠী দারিদ্র্য বিমোচনকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই অবস্থায় উন্নত দেশগুলোর কাছে বাজার সুবিধা চাওয়ায় জোর দিয়ে বলতে হবে যে, বাজার সুবিধার সরাসরি সুফল দরিদ্র জনগোষ্ঠী পাবে। বিশ্বব্যাপী প্রচারণায় দারিদ্র্য বিমোচন ও বাজার সুবিধার সম্পৃক্ততাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর তাই পোশাক শিল্পের মুনাফার স্বার্থে বিশ্বব্যাপী প্রচারণায় এর শ্রমিকদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

তবে বিশ্বব্যাপী প্রচারণার কৌশলগুলোকে অভ্যন্তরীণ পর্যায়ের যথাযথ উদ্যোগ ও প্রয়াসের মাধ্যমে সমর্থন দিতে হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলা যায় যে, পোশাক শিল্পের সাফল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে শ্রমিকদের জীবিকার মান উন্নত করে দেবে না। আর তাই দেশের ভেতরে প্রচারণায় সমতা, একীভূতকরণ ও অধিকারভোগীদের অংশগ্রহণ জরুরি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রচারণায় কেবল বাজার সুবিধা প্রাপ্তির সঙ্গে শ্রমিকদের কর্মসংস্থানকে সম্পৃক্ত করলে হবে না, বরং তৈরি পোশাক খাতের সুফলের প্রত্যক্ষ ভাগীদার করতে হবে। সরকার, উদ্যোক্তা ও শ্রমিকসহ অধিকারভোগীদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনার ভিত্তিতে এই শিল্পে শ্রমিকদের অধিকারের বিষয়টি নির্ধারণ করতে হবে।

এই খাতে শ্রমিকদের ভাগীদার করতে হলে অবশ্যই এমন কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে যেখানে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ উৎসাহিত হয় এবং বিশ্ব বাজারে সম্প্রসারণের ফলে প্রাপ্ত সুবিধার অংশীদারিত্ব দেওয়া হয়। শ্রমিকদেরকে মালিকানায় অংশীদার করার বিষয়টি যাচাই করে দেখা যেতে পারে। এনজিও, শ্রমিক ও সুশীল সমাজের উচিত এধরনের উদ্যোগে উৎসাহ যোগানো এবং সরকারের উচিত সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া। সরকার ও দাতারা ঋণ-অর্থায়নের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে শ্রমিকদের অংশ অধিগ্রহণের কাজটি করতে পারে।

পোশাকখাতে মালিকানার অংশীদারিত্ব সম্প্রসারণের ধারণাটি শ্রমিকদের জন্য অসাধ্য কিছু নয়। এনজিও বা দরিদ্রদের নিজেদের মাধ্যমেই বিশেষ মিউচুয়াল ফান্ড গঠন করা যেতে পারে। কেবল পোশাক শিল্প শ্রমিকদেরই নয় বরং বিশ্ব বাজার সুবিধা প্রাপ্ত অন্যান্যখাত থেকেও এখানে বিনিয়োগ করার জন্য আহবান জানানো অথবা সাহায্য দাতাদের কাছ থেকে তহবিল আনা যেতে পারে। দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে নিবেদিত সকল দাতা সংস্থাকে এধরনের উদ্যোগে সহায়তা দিতে এগিয়ে আসায় উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। এতে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের যেমন মুনাফার সুযোগ বাড়বে তেমনি অংশগ্রহণকারী দরিদ্ররাও লাভবান হবে।

অবশ্যই উপরে আলোচিত প্রস্তাবগুলো মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি সিদ্ধান্তের এবং প্রধান অধিকারভোগীদের ভূমিকা ও দায়িত্বের ওপর নির্ভরশীল। ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের স্বীকৃতি, মজুরি ও কাজের পরিবেশ উন্নয়ন এবং প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ শ্রমিকদের অধিকার স্বীকৃতির সূচনাপর্ব হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিকদের বৃহত্তর অংশগ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এসবের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নারী ও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতকরণের বিষয়টিও এগিয়ে যেতে পারে।

৪.১ জাতীয় পর্যায়ে প্রচারণা: অভ্যন্তরীণভাবে প্রতিযোগিতাশীলতা জোরদার করা

পোশাক শিল্প শ্রমিকদের বঞ্চনার দিকে দৃষ্টিপাত

(ক) অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোর মধ্যে প্রথমেই চলে আসে তৈরী পোশাক কারখানার শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দেওয়ার বিষয়টি। যতদিনই কাজ করুক না কেন প্রতিটি কর্মচারীরই নিয়োগপত্র পাওয়ার অধিকার রয়েছে, যেখানে কাজের শর্তাদি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে।
(খ) ১৯৯৪ সালে *ন্যূনতম মজুরি অধ্যাদেশ* প্রণয়ন করা হয়। এটি মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি না দেওয়ার সমস্যাটির সমাধান করবে। উচ্চ হারে মজুরি উৎপাদন খরচ হ্রাসে সহায়ক হতে পারে যদি কাজের পরিবেশ উন্নত করে ও শ্রমিকদের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো হয়।
(গ) কারখানা আইন ১৯৬৫ প্রয়োগ করা হলে শ্রমিকদের উন্নত কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

দক্ষতা উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা

নারী শ্রমিকরা ব্যবস্থাপকীয় বা অধিক জটিল কাজে পুরুষ শ্রমিকদের তুলনায় অদক্ষ বা কম উৎপাদনশীল- এ ধারণা ঠিকতো নয়ই বরং তা নারী শ্রমিকদের প্রতি শিল্প মালিকদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার প্রকাশ। তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশের স্বার্থে ওভেন ও নিট উভয় ধরনের তৈরী পোশাক কারখানায় সব ধরনের কাজের জন্য নারী শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের জন্য সহায়ক কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা জরুরি।

অপুষ্টি

আগেই বলা হয়েছে যে, তৈরী পোশাক শ্রমিকদের বেশিরভাগই অপুষ্টির শিকার। আবাসন ব্যয় মেটাতে গিয়ে তাদের আয়ের একটা বড় অংশ ব্যয় হয়ে যায়। যথাযথ স্বাস্থ্যব্যবস্থার অভাবে শ্রমিকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যধি বিস্তার লাভকরে যা তাদের উৎপাদনশীলতা বহুলাংশে কমিয়ে দেয়। অতিরিক্ত কাজ করার ফলে তাদের শক্তি ক্ষয় হয়, স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং উত্তেজনা বাড়িয়ে উৎপাদনশীলতা হ্রাস করে। স্বাস্থ্য সমস্যা মোকাবিলায় তৈরী পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান অপরিহার্য এবং এটি বিশ্বজনীন প্রচারণায় উঠে আসতে পারে।

কাজের পরিবেশ ও নিরাপত্তা

কাজের যথাযথ পরিবেশ ও মান না থাকার কারণে প্রতি বছরই তৈরী পোশাক শিল্পে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটছে। বেশিরভাগ কারখানায় কারখানা আইন ১৯৬৫-তে নির্দেশিত ন্যূনতম প্রয়োজনগুলো পূরণ করা হয়নি। বাড়তি বিনিয়োগ ও ব্যয়ের কথা বিন্তা করে শিল্প উদ্যোক্তারা কারখানার পরিবেশ উন্নয়নে আগ্রহী হন না। বহু কারখানায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। আর এই নিরাপত্তাহীনতাই বাজার হারানোর কারণ হতে পারে। কেননা ক্রেতারা এ বিষয়গুলোর দিকে নজর দিচ্ছেন। গার্মেন্টস শিল্পের জন্য কিছু আঞ্চলিক গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ করা হলে এ সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে। কেননা এই সেন্টারগুলোয় বিভিন্ন সুবিধা একসাথে পাওয়ার ব্যবস্থা থাকায় খরচ কমে আসবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন কারিগরি সহযোগিতা ও সরকারের সমর্থন । বিশ্বব্যাপী প্রচারণায় বিষয়টি উঠে আসতে পারে।

জীবিকার ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানো

ন্যূনতম মজুরি আইন ছাড়াও বাংলাদেশ আইএলও-র ১৩৮তম অনুচ্ছেদ অনুমোদন করেছে যেখানে শ্রমিকদের বিশ্বব্যাপী অধিকারগুলো স্বীকৃত হয়েছে। এতে ক্রেতা ও উন্নত দেশগুলো বাংলাদেশের প্রতি আস্থাবান হয়ে তার দাবিগুলোর প্রতিও অধিক মনোযোগী হয়েছে।

বেশিরভাগ শ্রমিক নারী হওয়ার কারণে শিশু যত্নের বিষয়টি এ শিল্পের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ। এই ইস্যু মোকাবিলায় বিভিন্ন প্রস্তাব রয়েছে । যেমন, শ্রমিকদের শিশুদের জন্য অভ্যন্তরীণ ডে কেয়ার সেন্টার প্রতিষ্ঠা অথবা শিল্প অঞ্চলের কেন্দ্রে কিছু ডে কেয়ার সেন্টার নির্মাণ। শিশুযত্নের ব্যবস্থা উন্নত করার ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ প্রচারণা কার্যকর হতে পারে। এনজিওগুলো সরকার ও শিল্প মালিকদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় এসব কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার কাজ করতে পারে।

আবাসন সুবিধা, সাপ্তাহিক ছুটি, পরিবহন ব্যবস্থা (বিশেষ করে রাতে যেসব নারী শ্রমিক বাড়ি ফেরে তাদের জন্য), ভাতা সুবিধাসহ মাতৃত্বকালীন ছুটি ও শারীরিক লাঞ্ছনা থেকে নিরাপত্তাসহ সকল ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে বাস্তবোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। একাজেও সরকার ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে এনজিওগুলো এগিয়ে আসতে পারে এবং শ্রমিকদের গৃহায়ণে বিনিয়োগ ও পরিবহন সুবিধার ব্যবস্থা করতে পারে।

সাব-কন্ট্রাক্ট কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা

বাংলাদেশের পোশাক শ্রমিকদের একটা বড় অংশ সাব-কন্ট্রাক্ট ভিত্তিতে কাজ করে থাকে। ১৫ থেকে ২০জন শ্রমিক নিয়ে কারখানাগুলো বড় কারখানাগুলো থেকে অর্ডার এনে কাজ করে। এসব কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা আরো শোচনীয়। মজুরিও অনেক কম। প্রচারণায় এধরনের শ্রমিকদের বিষয়টিও তুলে আনতে হবে।

'কমপ্লায়েন্স স্টিকার' প্রবর্তন

রপ্তানিযোগ্য পোশাক পণ্যের গায়ে 'শ্রমমান অনুসৃত হয়েছে' এধরনের স্টিকার সেঁটে দেওয়া হলে তা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হবে। এর ফলে আমদানিকারক দেশগুলো শ্রমমান মেনে না চলার অজুহাতে চট করে কোনো ধরনের অ-শুল্ক প্রতিবন্ধকতা চাপিয়ে দিতে পারবে না। আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত এ ধরনের স্টিকার বিশ্ব বাজারে অংশীদারিত্ব বাড়াতে সহায়তা করবে। আবার এই স্টিকার প্রবর্তন শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে ন্যূনতম মান অনুসরণে বাধ্য করবে এবং তারা শ্রমিকদের জীবিকা উন্নয়নের জন্য সচেষ্ট হবেন। সরকার, বিজিএমইএ ও শ্রমিক সংঘগুলো মিলে যৌথভাবে এই স্টিকার প্রদান ও তদারকির কাজটি সম্পন্ন করতে পারে।অবশ্য একাজে খরচও আছে। আর উদ্যোক্তারা বাজার সম্প্রসারণের সুবিধা পেলেই এটি গ্রহণ করবে। এ কারণে উন্নত দেশগুলোর এনজিওদের সঙ্গে মিলে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া হলে সেদেশের বাজারে এদেশী পণ্যের ভোক্তা অগ্রাধিকার ব্যবস্থার সুযোগ করে দেওয়া হবে।

প্রতিক্রিয়ার বিস্তার রোধ

এটা খুবই স্পষ্ট যে, ১৪ লাখ লোকের কাজ হারানো মানে তাদের ওপর নির্ভরশীল ১ কোটি লোকের জীবনে বিপর্যয় নেমে আসা। তৈরী পোশাক খাতের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে এভাবে কর্মহীনতা ও আয় নস্যাৎ হয়ে যাওয়া মানে অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্যও বন্ধ হয়ে যাওয়া। এর ফলে পোশাক খাতের বিপর্যয় গোটা অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করবে। আর তাই পোশাক শিল্পের বাজারের স্থায়িত্ব বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পোশাক শিল্পে শ্রমিকদের অধিকার

পোশাক শিল্পে শ্রমিক সংঘের কর্ম তৎপরতা নেই বললেই চলে। এর একটা বড় কারণ হলো শ্রমিকদের মধ্যে নারী শ্রমিকের প্রাধান্য। তবে ট্রেড ইউনিয়নের বিষয়টি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে, বিশেষত ইপিজেডে ট্রেড ইউনিয়ন চালু করা নিয়ে। ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা গেলেও বাংলাদেশের শিল্প উদ্যোক্তারা দেশে গঠনমূলক ট্রেড ইউনিয়ন ব্যবস্থা চালু নেই বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মালিক, শ্রমিক, সরকার ও সুশীল সমাজের মধ্যে গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়টির একটি সুরাহা হতে পারে।

আস্থা বৃদ্ধি

বহু এনজিও কর্মী ও শিক্ষাবিদ বলে থাকেন যে, বাংলাদেশের তৈরি পোশাকখাতের তুলনামূলক সুবিধা আসলে নারী শ্রমিকদের শোষণের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের কথা-বার্তা নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য এবং অর্থনৈতিকভাবে উৎপাদনবিমুখ। এ শিল্পে কর্মরত নারী শ্রমিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবদানকে স্বীকৃতি দেয়ার মাধ্যমে এ খাতের প্রতি

আস্থা বাড়ানো যেতে পারে। বিশ্বজনীন ও জাতীয় প্রচারণায় এটি উঠে আসতে পারে। এই প্রেক্ষিতে অভ্যন্তরীণ পদক্ষেপগুলো জরুরি। আর তাই প্রচারণায় নারী শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াতে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার আহ্বান থাকতে হবে।

আরেক দফা সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা

এই সমীক্ষাপত্রে প্রধানত বাজার সুবিধার ইস্যু এবং পোশাক শিল্পে সম্ভাব্য প্রভাবের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। আর্থ-সামাজিক দিকগুলো বিবেচনায় নিয়ে শ্রমিকদের জীবিকার ওপর এমএফএ অবসানের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া নিয়ে আরো বেশি সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী প্রচারণায় ২০০৫ সালে এমএফএ অবসানের ফলে তৈরি পোশাক খাতের অবস্থার বিষয়ে আরো গবেষণার বিষয়টি উঠে আসতে পারে।

হতাশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে আপদকালীন পরিকল্পনা

সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে যে, পোশাকখাতের অনেক দক্ষ শ্রমিক অন্য কাজে চলে যাচ্ছে। তৈরি পোশাকখাতের অনেক কর্মহীন মহিলা শ্রমিক আত্ম-কর্মসংস্থানের দিকে ঝুঁকছে। ব্র্যাকের মতো কিছু প্রতিষ্ঠান এই প্রবণতাকে উৎসাহিত করতে পোশাকখাতের কর্মচ্যুত নারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। বস্তুত পোশাকখাতে কর্মসংস্থান নারী শ্রমিকদের ভেতর আস্থা বাড়িয়েছে এবং অন্যখাতে আরো ভাল কাজের জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করেছে। তবে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশসমূহে নতুন কাজের সুযোগ আসলে খুব কম। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে একটি আপদকালীন পরিকল্পনা গড়ে তুলতে হবে যেন রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক শিল্পে বড় ধরনের বিপর্যয়ের ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক নেতিবাচক পরিস্থিতি সামাল দেওয়া সম্ভব হয়। সাম্প্রতিক বিশ্ব মন্দা এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলা পরবর্তী সময়ে এ ধরনের আপদকালীন পরিকল্পনার পদক্ষেপ গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ ধরনের আপদকালীন পরিকল্পনার জন্য সরকার, এনজিও ও শিল্প উদ্যোক্তাদের একযোগে কাজ করতে হবে।

৪.২ <u>বিশ্বব্যাপী প্রচারণা: তৈরি পোশাক খাতের বাজার পুনরুদ্ধার ও সম্প্রসারণ</u>

প্রচারণার আইনগত বৈধতা

বিগত দশকগুলোয় গ্যাট সমঝোতা প্রক্রিয়া এক রাউন্ড থেকে অন্য রাউন্ডে স্থানান্তরে উন্নত দেশগুলো ক্রমেই স্বীকার করেছে যে, মাল্টিলেটারাল ট্রেডিং সিস্টেমের (এমটিএস) যে কোনো চুক্তির সার্বিক সাফল্য আসলে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সঙ্গে আলোচনা ছাড়া সম্ভব নয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সমঝোতায় উঠে আসতে পারে এমন অনেক বিষয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অবস্থান দুর্বল করে দেওয়া। উন্নত দেশগুলো নিজেদের স্বার্থহানি না করেই উন্নয়নশীল দেশগুলোর কিছু বিষয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে। উরুগুয়ে রাউন্ড প্রবর্তনের মন্ত্রী পর্যায়ের ঘোষণায় বলা হয়েছে:"স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বাণিজ্যিক সুযোগ সম্প্রসারণে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপের সুবিধা থাকা উচিত।" মারাকাশে (১৯৯৪) মন্ত্রীরা আরেকবার *স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদক্ষেপ* অনুমোদন করেছেন যেখানে বিভিন্ন চুক্তিতে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অনুকূলে গ্রহণীয় পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এসবের মধ্যে আছে:

- এলডিসিসমূহের পণ্য রপ্তানির স্বার্থে শুল্ক ও অশুল্ক ছাড়ের এমএফএন (মোস্ট ফেভারড নেশন) পদক্ষেপগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন;
- এলডিসি থেকে রপ্তানির স্বার্থে জিএসপিসহ বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপের উন্নয়ন;

- এলডিসিসমূহে কারিগরি সহায়তা বাড়াতে প্রতিশ্রুতি;
- উন্নয়নশীলদেশগুলোকে দেওয়া এসএন্ডডি-র আরেক দফা সম্প্রসারণ;
- স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য বিভিন্ন বিধানের বাস্তবায়নের মেয়াদ বৃদ্ধি করা।

এসব প্রতিশ্রুতিকে দারিদ্র্য বিমোচন এবং পোশাক শিল্প খাতের দরিদ্র শ্রমিকদের মানবাধিকারের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে। সিঙ্গাপুরে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে (১৯৯৬) বিশ্ব বাণিজ্যে সম্পৃক্ত হওয়ায় উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য পৃথক ফলাফলের বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। উরুগুয়ে রাউন্ড পরবর্তী সময়ে এসব প্রতিশ্রুতি কতোখানি বাস্তবায়িত হয়েছে তা এখন পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। বস্তুত উন্নত দেশগুলোর অপূর্ণ প্রতিশ্রুতিগুলোর একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ গার্মেন্টস শিল্প নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রচারণার চমৎকার সূত্রপাত হতে পারে। নিম্নে প্রচারণার কিছু নির্দিষ্ট বিষয় তুলে ধরা হলো।

দারিদ্র্য বিমোচন ও পোশাকখাতের সহায়তামূলক উদ্যোগগুলোর সম্পৃক্তকরণ

বিশ্বব্যাপী প্রচারণায় তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য বাজার সুবিধা, কারিগরি সহযোগিতা এবং আরো অধিক গণতান্ত্রিক বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থার উদ্যোগের বিষয়গুলোকে বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত দেশের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। প্রচারণায় এটা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে, পোশাকখাতকে সমর্থন দেওয়ার যে কোনো পদক্ষেপের সুফল পাবে দরিদ্র শ্রমিকরা। তাই প্রচারণায় দুটো ইস্যুতে জোর দেয়া উচিত: প্রথমত, পোশাকখাত ও দারিদ্র বিমোচনের মধ্যে সংযোগ; দ্বিতীয়ত, এই সংযোগ জোরদার করতে অভ্যন্তরীণ উদ্যোগ।

<u>প্রস্তাব: বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে বিশ্বব্যাপী প্রচারণাকে সম্পৃক্ত করতে হবে</u>

বাজার সুবিধার বিস্তার

তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের জীবিকার মান উন্নয়নের জন্য বিশ্বব্যাপী প্রচারণার কেন্দ্রে উন্নত দেশগুলোতে স্থায়ী বাজার সুবিধা পাওয়ার বিষয়টি থাকতে হবে। দ্বিপাক্ষিক ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতায় উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের জন্য বাজার সুবিধা বাড়াতেই হবে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বিশেষায়িত ও পৃথকীকৃত ব্যবস্থার আওতায় বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক সুবিধা পাওয়ার জোর দাবিদার। আর তাই বিশ্বব্যাপী প্রচারণায় বাজার সুবিধা হবে অন্যতম উপাদান।

<u>প্রস্তাব: উন্নত দেশগুলোর বাজারে স্বল্পোন্নত দেশগুলো থেকে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা দাবি করতে হবে। আরো দাবি করতে হবে যে, স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ওপর দ্বৈত আচরণ চলবে না এবং প্রতিটি স্বল্পোন্নত দেশের জন্য কোটামুক্ত সুবিধা প্রয়োগ করতে হবে।</u>

<u>*কারিগরি সহযোগিতা নিশ্চিতকরণ*</u>

কারিগরি সহযোগিতায় অর্থায়ন এবং এটি ও দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম নিয়মিত মূল্যায়ন ও নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি সার্বিক ও সমন্বিত কর্মকাঠামো প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বিশ্বব্যাপী প্রচারণায় প্রাধান্য দিতে হবে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিধিতে

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য এ ধরনের কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের সুযোগ রাখতে হবে। স্বাস্থ্যব্যবস্থা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও বিপণন কার্যক্রমে কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে এ খাতের সমস্যাগুলো সমাধানে অবদান রাখা সম্ভব হবে। এসব ক্ষেত্রে আর্থিক সম্পদের প্রয়োজন, আর কারিগরি সহযোগিতা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বস্তুত বাংলাদেশসহ বহু উন্নয়শীল দেশ তাদের কারিগরি সহযোগিতা পাওয়ার দাবিটি উত্থাপন করেছে।

প্রস্তাব: কারিগরি সহযোগিতাকে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের অধিকার হিসেবে তুলে ধরা উচিত। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার একটি পদ্ধতিগত অংশ হিসেবে এর যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা উচিত।আগামীতে ডব্লিউটিও-র যে কোনো সমঝোতা প্রক্রিয়ায় এটিকে পূর্বশর্ত হিসেবে দাবি করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সমন্বিত কাঠামো (ইন্টেগ্রেটেড ফ্রেমওয়ার্ক)-এর কার্যকর বাস্তবায়ন যেন অতিরিক্ত গুরুত্ব না পায়।

নৈতিক ক্রয় উৎসাহিতকরণ

বিশ্বজনীন প্রচারণায় উন্নত দেশগুলোকে নৈতিক ক্রয়ে উৎসাহিত করতে হবে। এর লক্ষ্য হবে ভোক্তা ও খুচরা বিক্রেতা উভয়ই। এজন্য প্রচারণায় এটা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যে, পশ্চিমা ভোক্তা ও ক্রেতাদের যেকোনো সদিচ্ছার নিদর্শন পোশাক শিল্পের শ্রমিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। এ কাজে উন্নত দেশগুলোর সরকারের সহযোগিতাও চাওয়া যেতে পারে।

প্রস্তাব: নৈতিক ক্রয়ের ধারণা উৎসাহিত করতে হবে এবং উন্নত দেশগুলোর ভোক্তা-ক্রেতার সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হতে হবে।

বিশেষায়িত ও পৃথকীকৃত ব্যবস্থার (এসএন্ডডি) বাস্তবায়ন

এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠার ৭ বছর পরও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসএন্ডডি সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করা হয়নি। উন্নত দেশগুলোর নিজস্ব আইন ও আর্থিক নীতিমালার কারণে এসএন্ডডির বহু কিছু বাস্তবায়ন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। উন্নত দেশগুলো এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপও নেয়নি। আর তাই প্রচারণায় এটি অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

প্রস্তাব: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন বিধানে 'সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নেয়া হবে' ইত্যাদি অস্পষ্ট কথা পরিবর্তন করে এসএন্ডডি বিধানসমূহকে আরো বেশি প্রতিশ্রুতির বাধ্যবাধকতামূলক করতে হবে।

যে কোনো নতুন রাউন্ড সমঝোতার পূর্বশর্ত

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিগত বছরগুলো স্বল্পোন্নত দেশের জন্য ছিল কঠিন শিক্ষার সময় । বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিভিন্ন নিয়মের পর্যালোচনা যেমন এটিসির বাস্তবায়ন কার্যক্রমের মূল্যায়ন কঠিন সমালোচনার মুখে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে কোটা অপসারণ করে বাজার খুলে দেওয়ার সুবিধা নতুন নিয়মকানুনের ফলে হারিয়ে যেতে বসেছে। যেহেতু বাংলাদেশসহ অনেক স্বল্পোন্নত দেশের জন্য তৈরি পোশাক রপ্তানি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু এটিসির একটি সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে নতুন কোনো বাণিজ্য সমঝোতার পূর্বশর্ত হিসেবে জুড়ে দেওয়া যেতে পারে।

প্রস্তাব: স্বল্পোন্নত দেশসমূহের পোশাক শিল্প বা অন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ খাতের ওপর উরুগুয়ে রাউন্ডের প্রভাব সার্বিক পর্যালোচনা ছাড়া কোনো নতুন রাউন্ড শুরু করা যাবে না। স্বল্পোন্নত দেশসমূহের চাহিদা পূরণে জোরালো প্রতিশ্রুতি আদায় করতে হবে।

পণ্যমান ও অশুল্ক প্রতিবন্ধকতাসমূহ

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা যেহেতু বিশ্ব বাণিজ্যকে একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্মে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেহেতু সম্পৃক্তকরণ প্রক্রিয়ায় বাণিজ্য-বহির্ভূত ইস্যুসমূহকে টেনে আনা ঠিক নয়। নতুন ধরনের বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রতি আস্থা কমিয়ে বিরোধপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। আর তাই মান ও অশুল্ক প্রতিবন্ধকতাগুলোকে আলাদা করে রাখার বিষয়টি প্রচারণায় তুলে আনা দরকার।

প্রস্তাব: ডব্লিউটিও-র বিভিন্ন বিধানে পণ্যমানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের বাজার প্রবেশের সম্ভাবনাকে সংকুচিত করা হয়েছে। এটা মানা যায় না এবং এর বিরুদ্ধে শ্লোগান তৈরি করতে হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে উন্নত পরিবেশগত মান আরোপের বিষয়ে উন্নত দেশগুলোকে সংবেদনশীল হতে হবে এবং প্রয়োজনে এধরনের কাজে রপ্তানিকারক স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে কারিগরি সহযোগিতা দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

সিভিডি/এডিডির মতো অশুল্ক প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণ

পোশাক শিল্পকে সম্ভাব্য এডিডি/সিভিডি আরোপ থেকে রক্ষা করতে হলে সম্মিলিতভাবে এরকম একটা দাবি তোলা যেতে পারে যে, স্বল্পোন্নত দেশগুলো এন্টিডাম্পিং প্রক্রিয়ার বাইরে থাকবে। অথবা এধরনের পদক্ষেপের বর্তমান প্রান্ত সীমা সম্প্রসারণ করতে হবে।

প্রস্তাব: সকল স্বল্পোন্নত দেশ এন্টিডাম্পিং প্রক্রিয়ার বাইরে থাকবে। তা না হলে অন্তত এডিডি রহিতকরণ সীমা এলডিসি থেকে আমদানির বর্তমান ৩ শতাংশ -এর স্থলে অন্তত ১০ শতাংশ করতে হবে।

এটিসির প্রচ্ছন্ন সুবিধাগুলো কাজে লাগানো

এটিসি অনুসারে ১০ বছরের মধ্যে কোটা অপসারণ করা হবে। কিন্তু বাংলাদেশের মতো অনেক স্বল্পোন্নত দেশ এখনও কোটামুক্ত পরিবেশের জন্য প্রস্তুত হতে পারেনি। কোনো কোনো দেশ আরো সংরক্ষিত এটিসি চাচ্ছে। স্বাল্পোন্নত দেশসমূহের স্বার্থে এটিসির বিভিন্ন নিয়মাবলী পর্যালোচনা করার সুযোগ আছে।বিশ্বব্যাপী প্রচারণায় দু'টো বিকল্প দিকের ওপর জোর দেয়া যেতে পারে। (ক) এটিসির বাস্তবায়ন দীর্ঘায়িত করা; (খ) তৃতীয় পর্যায় (২০০২) থেকেই স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য উন্নত দেশগুলোর বাজারে কোটামুক্ত বাজার সুবিধা প্রদান করা যা ২০০৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যখন অন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর কোটা ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

প্রস্তাব: এটিসির বিধিমালার আওতায় প্রদত্ত সুবিধাগুলির আলোকে এটিসির একটি সার্বিক ও পূর্ণাঙ্গ পর্যালোচনা ।